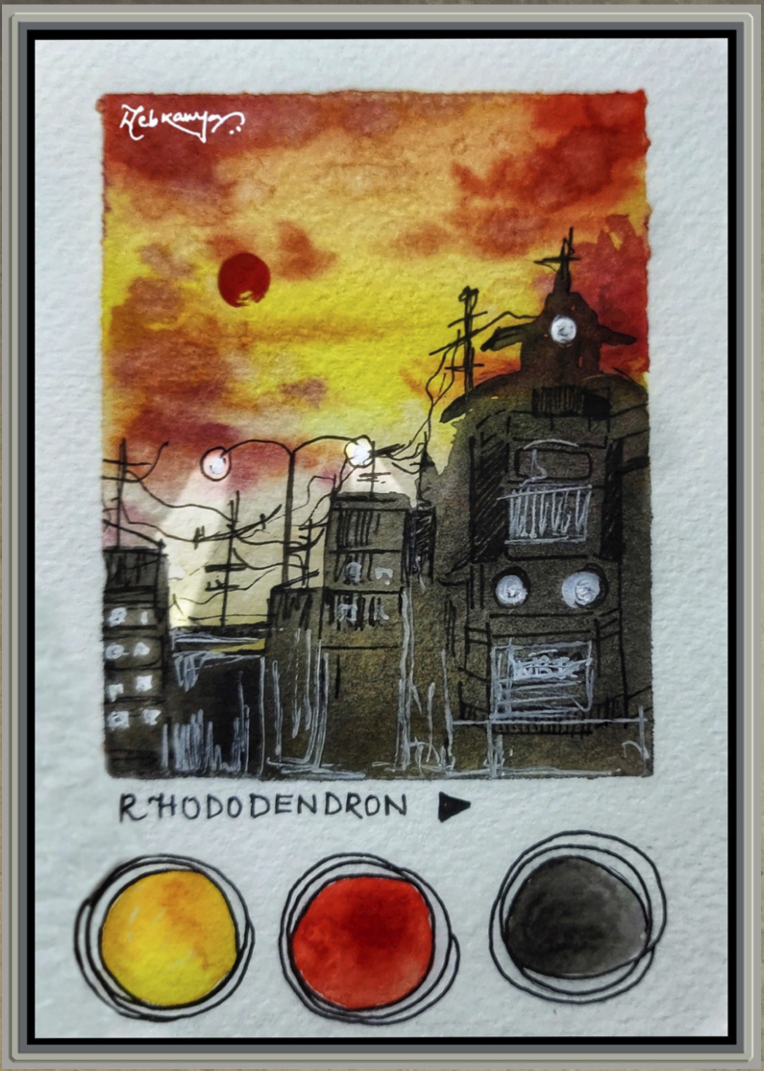

Rhododendron by Debkanya Sengupta

Peace by Meeta Chanda

শ্রদ্ধাঞ্জলি

কল্যাণ দাশগুপ্ত (প্রয়াণ – ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০১৯)

কল্যাণ দাশগুপ্ত দক্ষিণ কলকাতার সেন্ট লরেন্স স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার পর শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ থেকে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারীং পাশ করে প্রথম চাকরী শুরু করেন লার্সেন ট্যুবরোতে। লার্সেন ট্যুবরোর কাজ তাঁকে একেবারেই আকৃষ্ট করতে পারেনি। কারণ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দীক্ষা ইঞ্জিনিয়ারিং এ হলেও ভাষাতত্ত্ব ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। সম্পুর্ণ নিজের চেষ্টায় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সেই সব ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল জাপানি ভাষা। ভাষাতত্ত্ব নিয়ে গবেষনা করার যখন সুযোগ খুঁজছিলেন সেই সময় হঠাৎই জাতীয় অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের সাথে দেখা করার সুযোগ আসে। কল্যাণদার প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে সুনীতি চ্যাটার্জী অনতিবিলম্বে যোগাযোগ করেন প্রশান্ত মহলানবীশের সাথে। প্রশান্ত মহলানবীশ কল্যাণদাকে অনুরোধ করেন ইণ্ডিয়ান স্টাটিস্টিকাল ইনস্টিট্যুটের অন্তর্ভুক্ত Statistical Publishing Society তে যোগদান করার জন্য। মাস তিনেকের মধ্যে লার্সেন ট্যুবরোর কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে আসেন ইণ্ডিয়ান স্টাটিস্টিকাল ইনস্টিট্যুটে। কলকাতা শহর তখন নকশাল আন্দোলনে বিধ্বস্ত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও বিপর্যস্ত। কাজের পরিবেশ একেবারেই অনুকূল নয়। ইতোমধ্যে জাপানি বন্ধুদের সহযোগিতায় সুযোগ এসে যায় জাপান ভ্রমণের। ব্যবস্থা হয়ে যায় জাপানে প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের। তিনমাসের মধ্যে স্কলারশিপ নিয়ে সপরিবারে চলে যান জাপানে। জাপানি ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য থাকা সত্তেও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অভাব অনুভব করে প্রশিক্ষণ শেষে ভর্তি হয়ে যান টোকিও ইয়ুনিভার্সিটি অফ ফরেন স্টাডিজ এ জাপানি ভাষার M.A কোর্সে। জাপানে থাকার সময় অধ্যাপনা, এবং অনুবাদ ছিল তাঁর মূখ্য পেশা। এছাড়াও তিনি রেডিও জাপানের সাথে জড়িত ছিলেন দীর্ঘকাল ।

প্রায় দুদশক জাপান বাসের পর সুযোগ পেয়ে যান শিক্ষাদীক্ষার পীঠস্থান আমেরিকাতে অধ্যাপনা করার। শান্ত পরিবেশে অধ্যাপনা করেন অবসর গ্রহণের আগে পর্যন্ত। ■

কল্যাণদা

- রঞ্জন (গৌতম) গুপ্ত

কাঁধে স্কুলের ব্যাগ নিয়ে বাড়ী ফিরছিল ছেলেটা। হঠাৎ রাস্তায় চোখ পড়ে এক টুকরো কাগজের উপর যাতে সম্পূর্ণ অচেনা কোনো ভাষায় কিছু লেখা আছে। অসম্ভব উৎসাহে কুড়িয়ে নেয় সেই কাগজের টুকরোটা। সযত্নে ভাঁজ করে রাখে ব্যাগের ভিতর। বাড়ি ফিরে পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে বারবার খুলে দেখে। মর্মোদ্ধার তো দূরের কথা, কোন ভাষায় লেখা তারও কোনও হদিশ মেলেনা। জানার আকাঙ্খা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাড়ির বড়দের কাছে সেই কাগজের টুকরোটা দেখিয়ে জানতে চায়, এটা কোন ভাষা। শুধুই যে সঠিক উত্তর মেলেনা তাই নয়, প্রকারান্তরে তাঁরা এসব অহেতুক জিনিষ নিয়ে চর্চা করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেন। কিশোরটির উৎসাহ তাতে বিন্দুমাত্র কমে না। অবশেষে একজনের কাছ থেকে জানতে পারে যে এটা সম্ভবত চীনা বা জাপানি ভাষায় লেখা। তার কাছ থেকে এও সন্ধান পায় যে দক্ষিণ কলকাতায় একটি বৌদ্ধ মন্দির আছে। সেখানকার পুরোহিত জাপানি। কাগজটা তাঁকে দেখালে, তিনি হয়তো কিছু সাহায্য করতে পারেন। গুরুজনদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিশোরটি একদিন পৌঁছে যায় সেই বৌদ্ধ পুরোহিতের কাছে এবং জানতে পারে যে কাগজটিতে যে অক্ষরগুলি লেখা আছে, সেটি হোলো জাপানি। প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে বাড়ি ফেরে এবং মনস্থির করে ফেলে এই ভাষাটি তাকে রপ্ত করতেই হবে। সেই যুগে নানান কারণে বিদেশি ভাষা হিসাবে জাপানি ভাষা শেখার কোনও বিশেষ আগ্রহ ছিলোনা ভারতবর্ষে। তাই তার জাপানি ভাষার উপর অদম্য উৎসাহ গুরুজনদের কাছে অহেতুক বলে মনে হয়েছে। সেই সময়ে জাপানি ভাষা শেখার তেমন কোনও ব্যবস্থাও ছিলোনা কলকাতায়। তাই স্কুলের লেখাপড়ার সাথে সাথে সম্পূর্ণ নিজের প্রয়াসে শিখতে শুরু করে দেয় জাপানি ভাষা। এইভাবেই কল্যাণ দাশগুপ্তর (ওরফে বাবলুদার)জাপানি ভাষা এবং ভাষাতত্ত্বের উপর গভীর প্রেমের সূত্রপাত হয় সেই কৈশোর থেকেই।

স্কুলের গণ্ডি পার করে ভর্তি হন শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে। ছেলেরা বড় হয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার হবে, সেই ছিল ঐ যুগের অভিভাবকদের প্রথাগত চিন্তাধারা। ততদিনে কল্যাণদার মধ্যে যে ব্যতিক্রমী ধারার বীজ বপন হয়ে গেছে, তা ধীরে ধীরে চারা গাছে পরিণত হতে শুরু করেছে। কলেজ জীবনেই তিনি অর্জন করে ফেলেন জাপানি ভাষায় ব্যুৎপত্তি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় তার কাছ থেকে শোনা তার কলেজ জীবনের একটা মজার ঘটনার কথা। কলেজে পড়ার সময়ে একবার কোনো কারণে জাপানি প্রতিনিধিদের একটি দল বি.ই কলেজ সফরে আসেন। সফররত জাপানিদের সাথে কথোপকথনের জন্য তাঁকে ডাকা হয় দোভাষী হিসাবে কাজ করতে। তাঁকে জাপানিদের সাথে অনর্গল জাপানি ভাষায় কথা বলতে দেখে কিছু ছাত্রের ধারণা হয়েছিল তিনিও জাপানি। একটি ছাত্র তার বন্ধুদের কাছে মন্তব্য করে "দেখ দেখ, এই জাপানিটা কিরকম বাঙ্গালীদের মত দেখতে"।

ভাষাপ্রেম ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয় এবং ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় পারদর্শিতা অর্জন করে ফেলেন আরও বেশ কয়েকটি বিদেশি ভাষায়। বিদেশি ভাষার জ্ঞানের পরিধি ক্রমশই বাড়তে থাকে। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে দেখেছি বিদেশি ভাষার লিঙ্গুয়াফোনের অঢেল সংগ্রহ। বিবিধ ভাষার জ্ঞান তাকে অনুপ্রাণিত করে ভাষাতত্ত্বের উপর জ্ঞানার্জনে। প্রাথমিক ভাবে বহুভাষাবিদ হিসাবে পরিচিতি লাভ করলেও আসল প্রতিভার উন্মেষ হয় ভাষাতত্ত্ববিদ হিসাবে। সে প্রসঙ্গে আবার যথাস্থানে আলোচনা হবে, তবে তার আগে দেখা যাক তার জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের রূপরেখা।

ইঞ্জিনিয়ারীং পাশ করার পর শুরু হল কর্মজীবন। মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিগ্রী নিয়ে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী কর্মজীবন শুরু হল লার্সেন ট্যুবরো নামে এক ইঞ্জিনিয়ারীং প্রতিষ্ঠানে । কিন্তু অচিরেই তাঁর বোধগম্য হল পেশাগত চাহিদা এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছায় বিস্তর ফারাক। অন্নসংস্থানের তাগিদ আর পাণ্ডিত্য অর্জনের অদম্য উৎসাহ – চলতে থাকে এই দুই-এর টানাপোড়েন। কর্মজীবনের এই প্রথম অধ্যায় কাটে দক্ষিণ ভারতের চেন্নাই শহরে। কর্মক্ষেত্র তেমন উপভোগ না করলেও বন্ধুবৎসল, মজলিসী এবং রসিক মানুষ হিসাবে অল্পদিনের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন বেশ কিছু উপকারী বন্ধুবান্ধবদের সাথে এবং তাঁদের সান্নিধ্যে সময়টা ভালোই কাটে। চেন্নাই এর প্রবাস জীবনে সঞ্চয় করেছিলেন অনেক মজার অভিজ্ঞতা যা পরবর্তী কালে বন্ধুবান্ধবদের সাথে আড্ডার আসরে প্রচুর আনন্দের যোগান দিয়েছে। এর পর অল্প কিছুদিনের জন্য কর্মসূত্রে বদলী হন খানস্বহালে।

নিজের নেশাকে যখন পেশায় রূপান্তরিত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, সেই সময় হাতে আসে এক অভাবনীয় সুযোগ। জাতীয় অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের সাথে দেখা করার সুযোগ মেলে। জাতীয়

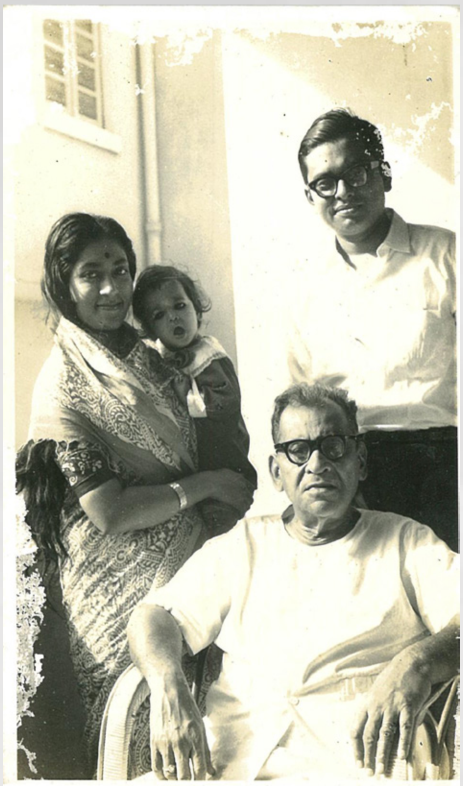

অধ্যাপকের কাছে নিজের জ্ঞানপিপাসার কথা নিবেদন করার জন্য পৌঁছে যান তাঁর বাড়িতে। সবিনয়ে নিজের পরিচয় দেন। জাতীয় অধ্যাপকের কাছ থেকে প্রথমেই প্রশ্ন আসে – আমার বাড়ির প্রবেশ পথ থেকে এই ঘর পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষায় একটি শব্দ লেখা আছে। তুমি কি বলতে পারো সেই শব্দটি কি এবং যেসব ভাষা তুমি জানো, সেইসব ভাষাতে কি তুমি পড়তে পারো শব্দটি? এক মুহূর্ত লাগে না জবাব দিতে। অনায়াসে বলে দেন শব্দটি কি এবং বিভিন্ন ভাষায় তার উচ্চারণ কি। প্রথম পরিচয়েই মুগ্ধ হন সুনীতি চট্টোপাধ্যায়। ঘটনাটা ১৯৬০ এর দশকের শেষ দিকের। সেই সময়ে কলকাতার আরেকজন সর্বজনবিদিত দিকপাল ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। সুনীতিবাবুর কাছ থেকে ফোন আসে তাঁর কাছে। সুনীতিবাবু ফোনে বলেন, তুমি তো বিভিন্ন জায়গা থেকে মণি-মুক্তো সংগ্রহ কর। আমার কাছে তেমনি একটি রত্ন আছে। তোমার প্রয়োজন থাকলে জানিও। কথাটা শোনামাত্রই মহলানবিশ জানান, ছেলেটিকে তাড়াতাড়ি আমার সাথে দেখা করতে বল।

অল্পদিনের মধ্যে কল্যাণ দাশগুপ্ত লার্সেন ট্যুবরোর কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে আসেন বরানগরের ইন্ডিয়ান স্টাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটে। ঘুরে যায় জীবনের গতিপথ। সেইসময় ইন্ডিয়ান স্টাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটে অনেক জাপানি বিজ্ঞানীর যাতায়াত ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁদের সাথে পরিচয় হয়। এছাড়াও আলাপ হয় অধ্যাপক নারা ৎসুয়োশির সাথে যিনি পরবর্তী কালে ইণ্ডোলজিস্ট হিসাবে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। এঁদের সকলের পরামর্শ ও সহায়তায় জাপানি ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কল্যাণ দাশগুপ্ত ১৯৭৩ সালে জাপানে চলে আসেন। এরপর তোকিয়ো বিদেশি ভাষা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাপানি ভাষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করে, সম্পূর্ণভাবে লেগে পড়েন সেই কাজে যার নেশায় পাগল হয়েছিলেন কৈশোর থেকে।

অর্থোপার্জনের জন্য বিভিন্ন কাজের মধ্যে একটি ছিল অনুবাদের কাজ। অনুবাদের দক্ষতা ছিল অসাধারণ। ১৯৮৩ সালে আমরা যখন

জাপানে আসি, তখন দেখেছি অনেক সময় জাপানি স্ক্রিপ্ট নিয়ে নিমেষের মধ্যে এবং অনায়াসে তার ইংরেজী অনুবাদ করে চলেছেন মুখে মুখে। তাই বলে অনুবাদের মান কখনও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি। ২০১০ সালের অঞ্জলিতে, তাঁর লেখা "রবীন্দ্রসাহিত্যের জাপানি অনুবাদ প্রসঙ্গে কিছু স্মৃতি"তে তেমনই একটি ঘটনার উল্লেখ পাই।

তোকিও বিদেশি ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে একটি বিদেশি ভাষা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হত। ১৯৭৫ সালে সেই প্রশিক্ষণটি ছিল বাংলা ভাষার উপর। অধ্যাপক নারা ৎসুয়োশির অনুরোধে সেই বছর কল্যাণদা ছাত্রদের সাহায্য করেন বাংলা বই-এর জাপানি অনুবাদ করায়। বেছে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণ"। এই প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলছেন,

"আমার ধারণা বাংলা থেকে অন্য কোনও ভাষায় অনুবাদ করা যে কতখানি দুরূহ তা এ কাজে হাত না দিলে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। ....

অনুবাদে একটি শব্দে হোঁচট খেতে হয়েছিল। শব্দটি জাপানিতে না থাকায় অনুবাদকেরা মূল ফরাসি থেকে ইংরিজিতে আমদানি এ শব্দটির কাতাকানায় লিপ্যন্তরিত জাপানি প্রতিশব্দটি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। আমি এতে আপত্তি জানিয়েছিলাম, আমার ইচ্ছা ছিল ক্ষুধিত পাষানের জাপানি অনুবাদে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ জাপানি ভাষার নিজস্ব শব্দভাণ্ডার থেকে চয়িত হবে। শেষ অবধি শব্দটি সৃষ্টি করতে হয়েছিল জাপানিতে"।

সেই সময় বেংগারু বুনগাকু দোকুশোকাই অথবা বঙ্গসাহিত্য পাঠচক্রের আয়োজন করা হয়। এর সাথে বেশ কিছুদিন সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন কল্যাণদা। বাংলা ভাষার ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহে ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ করার উদ্দেশ্যে একটি অতি উচ্চমানের সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশনা শুরু হয়, অধ্যাপক নারা যার নামকরণ করেন "কল্যাণী"। মূল বাংলা ভাষা থেকে যারা জাপানিতে অনুবাদ করেছেন তাঁরা অনেকেই কল্যাণদাকে স্মরণ করেন তাঁর সক্রিয় ভূমিকার জন্য।

ভাষাতত্ত্বের জটিল বিষয়গুলির মধ্যে থেকে আমাদের মত সাধারণ মানুষকেও আকৃষ্ট করবে এমন অনেক উদাহরণ ওনার মুখ থেকে শুনেছি। যেমন মজা করে বলতেন "নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ" করার মত বাংলার প্রকাশভঙ্গী আর কোনও ভাষায় সম্ভবতঃ পাওয়া যাবেনা, কারণ বাঙালি ছাড়া অন্য কোনও সমাজে এই ধারণার কথা লোকে হয়তো জানেওনা। বলতেন "নান চাত্তে বা দোওশিতে মো" ইত্যাদি জাপানী প্রকাশভঙ্গীর অনুরূপ প্রকাশভঙ্গীও বাংলায় পাওয়া যাবে না। জাপানিতে কিছু কিছু খাবারের স্বাদ বোঝানোর জন্য "সাপ্পারি আজি" শব্দটি ব্যবহার করা হয়। বাঙালি খাদ্যতালিকায় সুস্বাদু খাবারের সংখ্যা একেবারেই কম নয় কিন্তু তার মধ্যে কোনটা ঠিক সাপ্পারি আজি তা বলা শক্ত। ওনার কাছ থেকে শিখেছি জাপানি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ খোঁজার সময় উভয় দেশের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে নজর রাখার প্রয়োজনীয়তা।

জাপানি সংস্কৃতি প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে প্রায়ই বলতেন, যে দেশে দৃষ্টিনন্দন ব্যাপারটির উপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয় সেই দেশে দৃষ্টিহীনরা কিভাবে সেই সৌন্দর্য্য উপভোগ করবে? এই চিন্তার সূত্র ধরেই হয়তো বা কল্যাণদা আগ্রহী হয়ে পড়েন কানতেনজি অথবা ব্রেইলের মাধ্যমে চীনা অক্ষর লিখন পদ্ধতিতে। কানতেনজির অন্যতম পথিকৃত সাদাও হাসেগাওয়ার প্রবর্তিত কানতেনজির পদ্ধতির উপর গবেষণা শুরু করেন। সেই গবেষণার ভিত্তিতে ১৯৮৯ সালে Japan Times পত্রিকায় "Kanji it's the feeling that counts" শিরোনামে একটি রচনা প্রকাশ করেন। তারপর ২০০২ সালে The Journal of Visual Impairment and Blindness পত্রিকায় "Around the world: Brailed Kanji: The Hasegawa Approach" শিরোনামে হাসেগাওয়ার পদ্ধতির উপর তাঁর আরও একটি গবেষণামূলক রচনা প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালের গবেষকরা অনেকেই তাঁর গবেষণাপত্রের উল্লেখ করেন নিজেদের রচনায়।

কল্যাণদা যখন কানতেনজি নিয়ে গবেষণা করছেন সেই সময় তাঁর পরিচয় হয় অসাধারণ এক ব্যক্তির সাথে। আমরাও একই পরিবারের সদস্য হিসেবে সেই ব্যক্তির সাথে পরিচিত হওয়ার দুর্লভ সুযোগ পাই। তাঁর নাম সাতোশি ফুকুশিমা। বর্তমানে তিনি তোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। খুব অল্প বয়েসে তিনি প্রথমে দৃষ্টিশক্তি এবং অনতিকাল পরে শ্রবণশক্তিও হারান। প্রতিবন্ধকতার সাথে লড়াই-এ হার স্বীকার না করে অধ্যাপক ফুকুশিমার মা ছেলেকে এক অভিনব প্রক্রিয়ায় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। ছেলের আঙ্গুলের উপর আঙ্গুল বুলিয়ে অনেক কথা বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। একদিন অধ্যাপক ফুকুশিমা আমাদের বাড়িতে আসেন। সেই দিনের কথা আমার আজও মনে আছে। অধ্যাপকের সাথে এসেছিলেন একজন দোভাষী। তিনি অধ্যাপকের পাশে বসে তাঁর আঙ্গুলের উপর নিজের আঙ্গুল বুলিয়ে যাচ্ছিলেন। আর তারই মাধ্যমে চলছিল কথোপকথন। একবারও মনে হয় নি প্রতিবন্ধকতার জন্য কথোপকথনে কোনও বিঘ্ন ঘটেছে। শুনেছি নিজের বর্ণনা দিতে গিয়ে অধ্যাপক ফুকুশিমা কখনও বলেছেন "যেন মনে হয় গভীর জলে মাথা ডুবিয়ে আছি"। মনে পড়ে যায় হেলেন কেলারের কথা।

বিপুল পাণ্ডিত্য এবং বহুমুখী প্রতিভা থাকা সত্তেও নিজেকে প্রকাশ করার কোনও চেষ্টা কল্যাণদা কোনওদিন করেননি। তাঁর জ্ঞানের পরিধি এবং গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত "জাপানি হাইকু" বইটিতে। ২০০৬ সালের অঞ্জলিতে "হাইকুর অন্দরমহল" শিরোনামে তাঁর বইটির

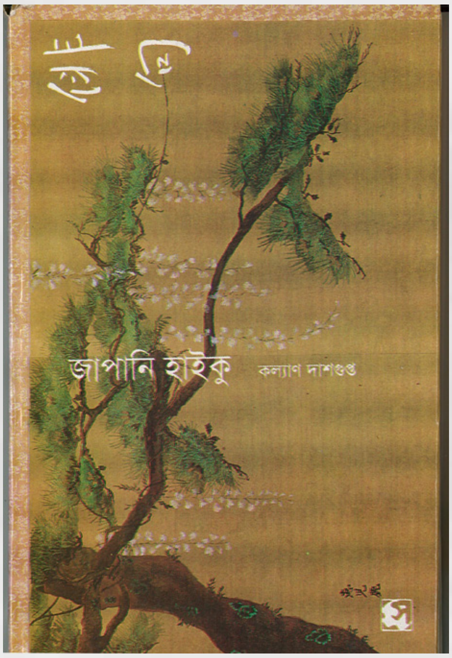

একটি গ্রন্থ পরিচয় আছে। তার শুরুর অংশটা এখানে উদ্ধৃত করছি।

পুরোনো পুকুর
ব্যাঙের লাফ
জলের শব্দ

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে এ হাইকু এক সেতুবন্ধন বাঙলা ও জাপানি কবি মানসের। সেই কাল থেকে আজকের সময়ের এই দীর্ঘপথ শুধু বিস্তৃতই নয়, বিচ্ছিন্ন। সেই ব্যক্তিগত ছেঁড়া ছেঁড়া প্রচেষ্টা অবশেষে এক দিশা পায় শ্রী কল্যাণ দাশগুপ্তের "জাপানি হাইকু"তে এসে।

অতি স্বল্প আলাপেও কল্যাণদার সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় পায়নি এমন লোক কম। ২০০৮ এবং ২০১০ এর অঞ্জলিতে কল্যাণদার দুটি হাস্যরসের কবিতা (প্রৌঢ়প্রলাপ) পাঠকদের অনেক আনন্দ দিয়েছে।

জাপানে তখন ভারতীয় তথা বাঙ্গালিদের সংখ্যা বেশ কম। তাই সাংগঠনিক ভাবে জাপানিদের সাথে সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের রেওয়াজ সেভাবে গড়ে ওঠে নি। কিন্তু কল্যাণদার সাথে বহু বিদগ্ধ জাপানির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং কল্যাণদার জাপানের বাড়িতে ছিল তাঁদের নিয়মিত আসাযাওয়া। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে সেই সময় আমরা কল্যাণদা/শিউলিদির সাথে একই বাড়িতে ছিলাম এবং সেই সূত্রে বহু বুদ্ধিজীবি জাপানিদের খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ লাভ করেছি। সেই সব সান্ধ্য অনুষ্ঠানে কল্যাণদা ছিলেন মধ্যমণি। দেখেছি কি অগাধ পাণ্ডিত্যের সাথে জাপানিদের সমৃদ্ধ করেছেন ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদিতে। অবশ্যই কথোপকথনের মাধ্যম ছিল জাপানি ভাষা। এইরকম সমাবেশে যে আনন্দ উপভোগ করতাম তা যেন আজকাল দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিলো অত্যন্ত জটিল। কিন্তু রসিকতার গুণে অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক হয়ে উঠত সেইসব সান্ধ্যবৈঠক।

১৯৯২ সালের মার্চমাসে জীবনের মোড় আরেকবার ঘোরে। সুযোগ এসে যায় আমেরিকার কলেজে অধ্যপনা করার। বহু স্বপ্নের দেশ জাপান ছেড়ে চলে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লীভল্যাণ্ড শহরে। পূর্ণমিলন ঘটে পেশার সাথে নিজের নেশার। সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেন পড়ানো এবং পড়াশোনার কাজে। শিক্ষাদীক্ষার পীঠস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেয়ে যান জ্ঞান অর্জনের অফুরন্ত সুযোগও। কল্যাণদার ভাষায়, অন্নসংস্থানের জন্য ক্ষুণ্ণবৃত্তির প্রয়োজন মিটে যায়। নতুন জীবনে খুঁজে পান প্রভূত আনন্দ। আমেরিকান ছাত্রছাত্রীদের জাপানি ভাষা শেখানোর সাথে সাথে পরিচয় করিয়ে দেন জাপানের সংস্কৃতির সাথে। এছাড়াও আমেরিকায় বড় হওয়া বাঙালি ছেলেমেয়েদের বাংলা শেখানোর জন্য ক্লীভল্যাণ্ডে শুরু করেন বাংলা স্কুল। স্বামী-স্ত্রীর উদ্যোগে এবং অন্যান্য বাঙ্গালিদের পৃষ্ঠপোষকতায় সেই স্কুলের মাধ্যমে স্থানীয় বাঙালি পরিবারের ছেলেমেয়েদের একটি নতুন সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

আমার স্ত্রী রুমার কথা

"ভালো করে পড়াশোনা না করলে ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার" এই আপ্তবাক্য ছোটবেলা থেকে শুনে শুনে বড় হয়েছি। ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার উদ্দেশ্যে তথাকথিত ভালো করে পড়াশোনা করার দৃষ্টান্তও দেখার সুযোগ আশে পাশে অনেক হয়েছে। কিন্তু জ্ঞান অর্জনের নির্মল আনন্দ লাভ করার জন্য পড়াশোনা করার দৃষ্টান্ত, শুনে থাকলেও খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ আগে মেলেনি। ১৯৮৩ সালে আমরা জাপানে আসার পর আমার ননদ শিউলি দাশগুপ্তর পরিবারের সাথে একসাথে ছিলাম। সেইখানে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে আমার ননদাই বাবলুদাকে, যার মধ্যে সত্যিকারের জ্ঞানপিপাসা কাকে বলে তার পরিচয় পাই।

তাঁর ব্যক্তিগত বই-এর সংগ্রহটি ছিল বিশাল আর বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য আমাকে বিস্মিত করত। মনে মনে ভাবতাম এত বই এবং এত ধরণের বই একটা মানুষ কি করে পড়ে ফেলতে পারে! কিন্তু ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছি ওঁর মত মানুষের পক্ষেই সেই কাজ করা সম্ভব। কতখানি একাগ্রচিত্ত হলে গল্পগুজব আড্ডার মধ্যে বসেও একজন বই পড়ে যেতে পারে তা ওনাকে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। একবার শিউলিদির সমস্ত গয়না হারিয়ে যায়, তাতে বাবলুদা যতটুকু দুঃখ পেয়েছিলেন, তার তুলনায় অনেক অনেক বেশি দুঃখ পেতেন বই হারালে।

তাঁর জ্ঞানের আলো সর্বদাই বিচ্ছুরিত হত তাঁর কথাবার্তায়। অনেক ভাষা জানতেন বলেই কি না জানি না, তাঁর কথাবার্তায় বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় ছিল। একটি ভাষায় কথা বলার সময় পারতপক্ষে অন্য ভাষা ব্যবহার করতেন না। যখন বাংলায় কথা বলতেন, তখন তার মধ্যে ইংরেজি বা জাপানি ভাষা মেশাতেন না। তেমনি ইংরেজি বা জাপানিতে বলার সময়ও একই নিয়ম মেনে চলতেন। দ্বিতীয় অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল শব্দচয়ন। প্রতিদিনের ব্যবহারিক কথাবার্তাতেও অত্যন্ত সুন্দর শব্দ ব্যবহার করতেন স্বাভাবিকতাকে বজায় রেখে। ওনাকে বলতে শুনেছি বাংলা ভাষাকে সত্যিই ভালোবাসলে আমরা প্রতিদিনের কথোপকথনে অনেক সুন্দর শব্দ ব্যবহার করতে পারি।

আমার দীর্ঘদিনের রেডিও জাপানের অনুবাদের হাতেখড়ি হয় বাবলুদার কাছে। রেডিও জাপানের কাজটা আমি পেয়েছি বাবলুদার সাহায্যে। সেইসময় তিনি কলেজে অধ্যাপনা, অনুবাদের কাজ ছাড়াও রেডিও জাপানের সাথে যুক্ত ছিলেন। অনুবাদের মানের সাথে আপোষ না করতে উনিই আমাকে শিখিয়েছেন। অনুবাদের গুণগত মান বাড়ানোর জন্য ওনাকে দেখেছি এক একটি বাক্যের পিছনে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে। বেশ কিছু বছর রেডিও জাপানের গল্পের অনুষ্ঠানের জন্য মূল জাপানি ভাষা থেকে গল্প বাংলায় অনুবাদ করতেন। গল্পের ভালো অনুবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে গল্পটি পড়ার সময় পাঠকের মনে হয় সে মূল ভাষাতেই গল্পটা পাঠ করছে। বাবলুদার অনুবাদে সর্বদাই সেই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি। ওনার অনুবাদ ছিল খুব উৎকৃষ্ট মানের আবার একইসাথে খুব সাবলীলও। সেই অনুবাদে অনেক কঠিন জিনিসও সহজবোধ্য হয়ে উঠত যা কেবল খুব দক্ষ একজন অনুবাদকই করতে পারেন। বাবলুদার লেখা কেন আমাকে সবসময় এত আকৃষ্ট করত তার কারণ বোধহয় তাঁর শব্দসম্ভার, সুক্ষ্ম রসবোধ, পরিশীলতা, গতিময়তা আর লেখার সহজ সাবলীল স্টাইল। আমার দুঃখ হয় সেই সময়কার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করে রাখিনি।

ভাবতে বসলে বাবলুদার অনেক কথা মনে পড়ে যায়। ওনার কাছ থেকে সর্বদাই পেয়েছি ছোটবোনের প্রতি দাদার অপার স্নেহ। তাঁর শিশুসুলভ সারল্যের কথা সর্বজনবিদিত। আমরা ছিলাম তার নিত্যসাক্ষী। মনে হোত জীবনের কাছ থেকে ওনার তিনটে মাত্র চাহিদা – খাওয়াদাওয়া, আড্ডা, আর সর্বোপরি বই এর জগতে ডুবে থাকা। শেষ জীবন পর্যন্ত বাবলুদাকে কোনওদিন অর্থ, খ্যাতি, ইত্যাদির পিছনে ছুটতে দেখিনি। সারাজীবন নিজের আনন্দের রসদ নিজেই খুঁজে নিয়েছেন জ্ঞানার্জনের মধ্যে দিয়ে।

আমার ভ্রাতৃবধূ দেবযানীর কথা

১৯৮২ সালে বাবলুদাকে প্রথম দেখি অসম্ভব হাসি খুশি এবং মজলিশি একজন মানুষ। অগাধ পান্ডিত্য সত্ত্বেও নিরহঙ্কার এবং অমায়িক যার ফলে সকলের কাছেই তিনি ছিলেন প্রিয়। আসর জমানো মানুষ হিসাবে বাবলুদা ছিলেন অদ্বিতীয়। অসংখ্য বৈচিত্র্যময় গল্পের সম্ভার ছিল তাঁর ভাণ্ডারে, যার টানে ছোটবড় সকলেই আকর্ষিত হত তাঁর দিকে।

বাবলুদার বহুমুখী প্রতিভার আরেকটি দিক হল ছড়া লেখা, হাইকু অনুবাদ এবং কার্টুন আঁকা। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে খুব কম মানুষই আছেন যারা বিয়েতে বাবলুদার ছড়া সম্বলিত অ্যালবাম উপহার পাননি। খুবই ভোজনরসিক ছিলেন বাবলুদা। বিভিন্ন দেশীয় খাবার খেতে পছন্দ করতেন। তবে সবচেয়ে উপভোগ করতেন বাঙালি রান্না এবং বাঙলার মিষ্টি। কলকাতা ছিল বাবলুদার প্রাণের শহর। কলকাতার জীবনযাত্রা তিনি ভালোবাসতেন। কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে স্বস্তি বোধ করতেন। বহু বছরের প্রবাসী জীবনও তাঁর সেই বাঙলীয়ানাকে কেড়ে নিতে পারেনি। কলকাতার আত্মীয় বন্ধুমহল তাঁকে সদাহাস্যময় অজাতশত্রু একজন মজলিশি মানুষ হিসাবেই চিরকাল মনে রাখবে।

জাপানে গিয়ে দেখেছি, বাবলুদা হৈ চৈ আড্ডায় অংশ গ্রহণ করেও তাঁর নিজের কাজ অর্থাৎ দুরুহ তর্জমা করে যেতেন। ভাষার ওপর প্রচন্ড দখল না থাকলে কাজটি করা আদৌ সম্ভব নয় বলে মনে করি।

অনেক জাপানিকে বলতে শুনেছি, কল্যাণসান আমাদের থেকেও ভাল জাপানি বলতে ও লিখতে পারেন। কথাটি কত সত্যি তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। অধ্যাপক নারা বাবলুদার গুণগ্রাহী ছিলেন। বাবলুদার জাপান যাওয়ার পিছনে নারা সেনসেই-এর অবদান অনস্বীকার্য।

বাবলুদার আরেকটি গুণের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তা হোল, অত বড় মাপের মানুষ হয়েও উনি ছোটদের সাথে সমান আড্ডা দিতে পারতেন। গল্পের ছলে উনি বাচ্চাদের অনেক কিছু শেখাতেন। শিক্ষার প্রসারেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিতেন। বাবলুদা কলকাতায় এলে বেহালার ব্লাইন্ড স্কুলে যেতেন। যতদূর জানি, উনি বই ও টাকা দিয়ে ওদের সাহায্য করতেন।

Tribute from my son Ronnie

I remember seeing him since I was just four and half years old. The impression that got imprinted deep inside me about him since my early childhood was his worldviews, scholarly and off course his lovable nature. As I started growing, I came across with many brilliant people, yet my imagination of the embodiment of scholarship is synonymous to Pishai as I used to call him. I think myself so fortunate to see him closely for many years and for getting enlightened in various subjects. Over the years, I always wished to have long, engaging conversations about various topics with him. Unfortunately, he left before that could happen. I solemnly pray for his eternal peace.

I love you Pishai.

উপসংহার

কল্যাণদার খুব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগে অনেক সময় মনে হয়েছে কল্যাণদার যে পাণ্ডিত্য তার পরিচয় অনেকেই পান নি, এবং তার জন্য কল্যাণদাকে দিয়ে আরও কিছু করানোর প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে মাঝেমাঝেই ওনাকে বিরক্ত করতাম যাতে ওঁর প্রাপ্য খ্যাতি অর্জনের জন্য কিছু প্রচেষ্টা চালানো যায়। কিন্তু প্রচারবিমুখ মানুষটি নিজের জ্ঞানার্জনের আনন্দে বিভোর হয়ে থাকতে ভালোবাসতেন। মুখে বলতেন না তবে মনে হত বলতে চাইছেন "আমায় থাকতে দে না আপনমনে........"

কল্যাণদাকে ঘিরে আমাদের মত স্নেহধন্য আত্মীয় পরিজনদের অনেকের মনেই ওনার স্মৃতি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ■

A “Genuine” Person

- Rita Kar

At an IB (International Baccalaureate) workshop, I was attending, a question had been raised as to how to help children decipher between fake and genuine. It started from books, news, etc. but at one point, the discussion had shifted to "who is a genuine person"? Reference was made to an article by Travis Bradberry, published in Forbes, March 2016. Bradberry talks about the 12 habits of genuine people. I don't want to go into the details of all the twelve habits as that is not my purpose, but I will just choose a few in context.

1. Genuine people speak their minds but are not judgemental
2. They forge their own paths
3. They aren't motivated by material things and at the same time generous
4. They treat everyone with respect

With these points in mind, I pay my tribute to a person whom I have always respected and considered to be a "Genuine Person".

Soon after we had arrived in Japan we were invited to a Bengali home. We were total strangers - the host and the guest. On our arrival, the heartfelt welcome "*esho esho*" from our host is just what has stayed with us forever. His tone of greeting made us feel so at home - and I gathered - this is how we make strangers friends and then become more like an extended family in a foreign land. And thus, began our first acquaintance with the Dasgupta and Gupta family, and the Bengali community of Tokyo.

Over the coming months, we got to know the family and our bond grew stronger and we got to know even better our beloved and respected **Kalyan da** to whom I can attribute all the traits of a Genuine, loveable, and respected person.

Speaking his mind

Kalyan da had his own perspectives and opinions and always shared them with others yet never imposing them on others. At the same time, he showed true interest in the other person's questions and views in a very pleasant manner thus making everyday conversations meaningful.

Forging his own path

Kalyan da graduated as an engineer but forged an entirely new path guided by his passion for linguistics. He did not adhere to the conventional and safe path to be successful but chose the road that enriched his commitment.

Not motivated by material things

For Kalyan da, like any genuine person, showing off was not his nature. His feel-good came from his generosity, his friends, his family, his passion, and a sense of purpose.

Treat everyone with respect

Whether interacting with adults or children, scholars or layman, Kalyan da knew how to interact at every level - his respect for others made him approachable and available to all.

So, this was Kalyan da - finding joy and happiness in everything and sharing and spreading this joy amongst all.

I started with the IB Conference and I will conclude here with a reference to IB education, as that is what many of the International Schools in Japan follow.

IB teaches students to be naturally curious, thinkers, openminded, risk-takers, communicators, empathetic, and principled – all these traits were embodied in Kalyan da.

In conclusion, for those who don’t know Kalyan da, Kalyan Dasgupta was one of the earliest of Bengalis to come and settle down in Japan. From1973 – 1992 he along with his wife Seuli, inspired and helped many Indians who were new to Japan. Kalyan da loved Kolkata – and all that came with that city and perhaps fate took him to Kolkata from America to spend his last days in his beloved city. ■

কেমন হল গো? – কল্যাণদার স্মৃতি-

- কাজুহিরো ওয়াতানাবে

কল্যাণদাকে প্রথমে দেখেছি ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে, টোকিও গাইকোকুগো দাইগাকু ওরফে টোকিও বিদেশি ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার ক্লাসে যোগ দিয়ে। ওঁর মুখে অনর্গল জাপানি শুনে মনে করলাম উনি নিশ্চয়ই বহুদিন জাপানে বসবাস করছেন। পরে যখন জানতে পারলাম যে উনি মাত্র দুবছর আগে এখানে এসেছিলেন, তখন রীতিমত অবাক হলাম, সেইসঙ্গে কোনো বিদেশি ভাষা রপ্ত করতে আগ্রহী একজন শিক্ষার্থী হিসাবে আমার মন ভরে ওঠে কল্যাণদার প্রতি শ্রদ্ধায়।

সেই সময় আমি খুব বাংলা শিখতে চেয়েছিলাম। টোকিওর এক সিনেমা হলে সত্যজিৎ রায়ের অপু ট্রিলজি দেখে সেই ইচ্ছার জন্ম হয়। কিন্তু তখন জাপানে বাংলা শিখতে চাইলেও তার কোনো সুবিধা ছিল না। এমন কি বিদেশি ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে জাপানের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে বিবেচিত টোকিও বিদেশি ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়েও বাংলার কোনো নিয়মিত ক্লাস বসত না। আমি তখন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বছরের ছাত্র। হিন্দি শিখছিলাম। হিন্দি বিভাগের শিক্ষার্থীরা চাইলে হিন্দির পাশাপাশি সংস্কৃত ও মারাঠি শিখতে পারত। তবে বাংলা নিয়ে পড়াশোনার কোনো সুবিধা ছিল না সেই সময়। পাঠকদের মধ্যে হয়ত কেউ কেউ বলবেন, আরে, কেমন করে হয় এটা? নারা সেনসেই তো ছিলেন টোকিও বিদেশি ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে? হ্যাঁ, ঠিক তাই। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ও জাপানে বাংলা ভাষা গবেষণায় অন্যতম অগ্রণী ব্যক্তিত্ব ডঃ ৎসুয়োশি নারা তখন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন ও এ-এ কেন নামে পরিচিত এশিয়া-আফ্রিকা গবেষণা ইন্‌স্টিটুট (The Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa)-এর অধ্যাপক; সেখানে নারা সেনসেই-এর কাজ মূলত গবেষণামূলক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষার ক্লাসের সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্টতা ছিল না। তবে এ-এ কেনের বার্ষিক প্রকল্পের এক অংশ হিসাবে নারা সেনসেই-এর উদ্যোগে সে বছর বাংলা ভাষার ‘দ্রুত প্রশিক্ষণ কোর্স’ (আমার বিশ্বাস কল্যাণদা এই নাম দিয়েছেন)-এর আয়োজন করা হয়। উদ্দেশ্য, বাংলা ভাষাকে কার্যকরভাবে শেখানোর উপায় নিয়ে পরীক্ষা চালানো। অর্থাৎ আমি সহ ১৫ জন শিক্ষার্থী ছিলাম গিনি পিগ।

তবে গিনি পিগ হতে হলে ক্ষতি কী? বাংলা শেখার সুযোগ পেয়ে আমি মহা খুশি। দিনে ৬ ঘণ্টার ৬ সপ্তাহ স্থায়ী প্রশিক্ষণ কোর্সে সানন্দে যোগ দিতে শুরু করলাম।

কোর্সের প্রধান শিক্ষক ছিলেন নারা সেনসেই স্বয়ং। আরেকজন জাপানি শিক্ষক ছিলেন যিনি নাকি এনএইচকের রেডিওতে বাংলা অনুষ্ঠানের প্রযোজক হিসাবে কাজ করেন। এঁদের সঙ্গে ইন্‌ফর্মান্ট হিসাবে আমাদের সাহায্য করেছিলেন কল্যাণদা, মঞ্জুলিকা দি, জয়শ্রী দি ও আজাদ ভাই। আজাদ ভাই তখনও বিয়ে করেন নি। এর মানে, ভাল ও সুস্বাদু খাবার জুটত না ওঁর খাবার টেবিলে । স্বভাবতই উনি ভীষণ রোগা-পাতলা। কল্যাণদা কিন্তু একেবারে উলটো। রোজ শিউলিদির হাতের রান্না উপভোগ করে ওঁর অবয়ব ‘বাঙালি বাবু’ বলতে যা বোঝায়, ঠিক সেরকম। পরে একদিন উনি বাঙালি বাবুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করলেন; তাঁরা প্রায়ই পেটুক, এর ফলে স্বাস্থ্য তাঁদের ভাল (অন্য কথায় মোটা) হয় এবং তাঁরা ভীষণ কথা বলতে ভালবাসেন অর্থাৎ তারা আলাপী ও আড্ডাবাজ—-ব্যাখ্যাটা শুনে বুঝতে বাকি রইল না তখন যে টিপিক্যাল বাঙালি বাবুকে চোখের সামনে দেখছি !

৬ সপ্তাহ ব্যাপী কোর্স শেষ হবার পর ক্লাসে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে কয়েকজন বাংলা চর্চা চালিয়ে নিতে চায়। তারা সপ্তাহে একদিন একত্র হয়ে বসে বাংলায় লেখা বিভিন্ন গল্প ও কবিতা পড়তে শুরু করে। এই “বঙ্গ সাহিত্য পাঠচক্র” (এটাও কল্যাণদার নামকরণ) –এর কর্ণধার ছিলেন কল্যাণদা স্বয়ং। নারা সেনসেই-এর অফিসে বসা এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন মাসাইউকি ওনিশি, তামোৎসু নাগাই(যিনি এখন প্রয়াত) ও কিয়োকো নিওয়া, যারা পরবর্তীতে বাংলা সাহিত্য কর্মের জাপানি অনুবাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে শুরু করলেন। কলকাতা থেকে ফিরে এসে মাসাইউকি উসুদাও পরে এই সভায় আসতে শুরু করেন। সবাই হয়ত জানেন যে উসুদা সান পরে তোকাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েছেন, সেই সঙ্গে জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ “রূপসী বাংলা” ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস “শেষের কবিতা”-র মত বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

কল্যাণদা বাংলা শব্দ বা প্রকাশ ভঙ্গির সূক্ষ্ম অর্থ ও ব্যবহার নিয়ে বড় আগ্রহের সঙ্গে আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করতেন, যেগুলো অভিধান থেকে জানা সম্ভব নয়। তার একটা উদাহরণ ‘রীতিমত’ কথাটার ব্যবহার। প্রথমে ধরে নিয়েছিলাম এর মানে হবে ‘প্রথা অনুযায়ী যা হয়’ অর্থাৎ ‘যেভাবে প্রত্যাশা করা যায় ঠিক তেমনই’। কিন্তু কল্যাণদা বললেন এর ব্যবহারিক মানে তা নয়। উনি যেভাবে বুঝিয়ে দিলেন, আমি সেটি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছি কিনা, সেটা বরং আপনারাই বলুন এই বর্তমান লেখার শুরুতে কথাটার ব্যবহার দেখে।

কল্যাণ দার কাছে শেখা আরেকটি কথা যা আমার মনে গভীর দাগ কেটেছে, সেটি হল ‘অভিমান’। উনি ব্যাখ্যা করে বললেন, এর হুবহু অনুবাদ বা প্রতিশব্দ শুধু জাপানি ভাষা কেন, অন্য কোনো ভাষায় পাওয়া যাবে না। পরবর্তীকালে বেশ কয়েকজন বাঙালির সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে এবং তাঁদের সংস্পর্শে এসে আমি আস্তে আস্তে ধরে নিতে পেরেছি যে অভিমান জিনিসটা কী আর কল্যাণদা যা বললেন, সেটাই সত্য।

উনি বাংলা সংস্কৃতির আরেকটা দিক আগ্রহ সমেত আমাদের বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সেটি ছিল ‘আড্ডা’। আড্ডার সারমর্ম সম্পর্কে জানাতে গিয়ে উনি আড্ডা নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর লেখা প্রবন্ধ উপস্থাপন করলেন আমাদের পাঠ্য সামগ্রী হিসাবে। সেই সঙ্গে উনি একই লেখকের লেখা গল্প “আমরা তিনজন” পড়তে আমাদের উৎসাহিত করলেন। “আমরা তিনজন একসঙ্গে তার প্রেমে পড়েছিলাম : আমি, অসিত আর হিতাংশু; ঢাকায় পুরানা পল্টনে, উনিশ-শো সাতাশে। সেই ঢাকা, সেই পুরানা পল্টন, সেই মেঘে-ঢাকা সকাল!” এমন অতি সুন্দর ছন্দযুক্ত কথা দিয়ে শুরু হওয়া মনোমুগ্ধকর এই গল্পে মোহিত হয়ে আমি কল্যাণদার কাছে বায়না করেছিলাম পুরো গল্পটি ওঁর গলায় রেকর্ডিং করে দিতে। ব্যাপারটা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ এবং জটিল, কিন্তু উনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। যেকেউ বাংলা শিখতে চাইলে উনি কখনো তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে দ্বিধা করেন নি, এটি তার অন্যতম প্রমাণ।

‘বঙ্গ সাহিত্য পাঠ্যচক্র’তে আমার উপস্থিতি কমে যায় চাকরিতে ঢোকার পর। ‘বাংলা দ্রুত প্রশিক্ষণ কোর্স’-এ যিনি শিক্ষক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন, এনএইচকে-র সেই ভদ্রলোক হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দেওয়াতে অপ্রত্যাশিতভাবেই আমার সেই চাকরি জুটল। কল্যাণদাও তখন এনএইচকে-র বাংলা বিভাগে অনুবাদক ও ঘোষক হিসাবে কাজ

করছিলেন। তাই কাজের মাধ্যমেও কল্যাণদার কাছ থেকে আরও অনেক কিছু শেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। শুধু যে বাংলার ভাষাগত জ্ঞান ওঁর কাছে রপ্ত করেছি তা নয়; ওঁর কথার মাধ্যমে জাপানি ভাষা নিয়েও ধারণা পেয়েছি যা আমি আগে জানতাম না অথবা বিষয়টি নিয়ে তেমন খেয়ালই করতাম না। এনএইচকের বহির্বিশ্ব কার্যক্রম রেডিও জাপান (বর্তমানে ওরা অন্য নামে পরিচিত)-এ কাজের সাধারণ নিয়ম এমন ছিল যে চীনা ও কোরীয়-র মত মুষ্টিমেয় কয়েকটি বিভাগ ছাড়া বাকি সব ভাষা বিভাগ (সেই সময় শর্টওয়েবের মাধ্যমে ২১টা ভাষায় রেডিও অনুষ্ঠান প্রচার করা হত) মূলত জাপানিতে লেখা স্ক্রিপ্টের ইংরেজি অনুবাদ থেকে নিজ নিজ ভাষায় পুনরায় অনুবাদ করে তার ভিত্তিতে অনুষ্ঠান তৈরি করে। কিন্তু কল্যাণদা জাপানি স্ক্রিপ্ট থেকে সরাসরি বাংলায় অনুবাদ করতে পছন্দ করতেন। বলতেন, জাপানি ভাষা থেকে অনুবাদ করলে মূল লেখার মানে ও তাতে অন্তর্গত অনুভূতি আরও সঠিক এবং সুন্দরভাবে তুলে ধরা সম্ভব। আমার কাছেও ওঁর এই দাবি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে।

একদিন তিনি জানতে চান "হিরে নিকু" কী জিনিস? আমি অপ্রস্তুত হয়ে অপরিস্কার জবাব দিতে শুরু করেছিলাম এরকম বলে যে হিরে নিকু মানে ইয়ে, মাংসের এমন অংশ যেখানে চর্বি কম আর একটু দামী...তখন উনি আমাকে থামিয়ে সোৎসাহে বলে উঠলেন, আচ্ছা বুঝতে পেরেছি! fillet! আমি তখন পর্যন্ত জানতাম না সেই ইংরেজি (ফরাসি?) শব্দ থেকে জাপানি হিরে-নিকু কথাটার উৎপত্তি। তার আগে আমি তো গভীর চিন্তা ছাড়াই ভাবছিলাম, ইংরেজি fin (মাছ ইত্যাদির)-কে জাপানিতে 'হিরে' বলা হয়, তাই কথাটা তার সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং কল্যাণদার দৃঢ়কণ্ঠে সেই ঘোষণা না শুনলে এই শব্দের উৎপত্তি আমি হয়ত জীবনে জানতে পারতাম না।

তবে জলের স্রোত প্রথা অনুযায়ী সব সময় উঁচু (কল্যাণদা) থেকে নিচে (আমি)-র দিকে প্রবাহিত হয়, তাও ছিল না। এর ব্যতিক্রমও ঘটেছিল। সেই সময় অফিসে কম্পিউটারের প্রচলন ঘটে নি। বাংলা টাইপরাইটার ব্যবহারও কোনো ছিল না। তাই বাংলা বিভাগে কর্মরত বাঙ্গালিরা সবাই নিজের হাতে লিখে স্ক্রিপ্ট তৈরি করতেন এবং সেটি স্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে পড়তেন। একদিন কল্যাণদার সঙ্গে স্টুডিও গেলাম কোনো এক অনুষ্ঠান রেকর্ডিং করতে। রেকর্ডিং শুরু হয়েছে, কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরে উনি হঠাৎ স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এলেন। ওঁর হাতের বাংলা স্ক্রিপ্ট দেখিয়ে বললেন, "ওয়াতানাবে সান, আমি এখানে কী লিখেছি?"

কল্যাণদা দ্রুত অনুবাদ করতে পারতেন—ওঁর শব্দ ভাণ্ডার এত সমৃদ্ধ ছিল যে অনুবাদের জন্য যথাযথ শব্দ উনি অল্প সময়ের মধ্যে খুঁজে নিতে পারতেন। তার চেয়ে বড় কথা, উনি ভয়ংকর স্পীডে লিখতে পারতেন। কিন্তু মাঝেমাঝে এমন ঘটনাও ঘটেছিল যে খুব দ্রুত হাত নাড়ার ফলে লেখাটা এমন হয়েছে যে উনি নিজেই পড়তে পারেন না। সেদিন সেটাই ঘটেছিল। এদিকে, আমার অভ্যাস ছিল স্টুডিওতে যাওয়ার আগে অনূদিত স্ক্রিপ্টে চোখ বুলানোর। এতে প্রয়োজনে কোনো শব্দের মানে নিশ্চিত করা সম্ভব হত এবং অচেনা নতুন শব্দ ও তার ব্যবহার সম্বন্ধে জানার সুযোগও হত। এই কাজ করতে করতে, এবং সেই সঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশ থেকে আমাদের শ্রোতাদের পাঠানো চিঠি (বলাই বাহুল্য, হাতে লেখা) পড়তে পড়তে আমি বাংলা হাতের লেখা পড়ার ব্যাপারে একেবারে উস্তাদ বনে গিয়েছিলাম। যত 'অনন্য ধরনের' হাতের লেখা হোক না কেন, আমি সেটা পড়তে পারতাম বাংলা বিভাগের অন্য কারুর চেয়ে ভাল করে। সেই সূত্রে কল্যাণদার হাতের লেখা—অথবা হিজিবিজি বলা উচিত কিনা, কে জানে—আমি বিনা কষ্টে পড়ে ফেলতে পারতাম।

চাকরির বাইরেও কল্যাণদার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বন্ধন ও বন্ধুত্ব গভীর হতে থাকে। উনি প্রায়ই আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতেন। প্রথমে মিনামি-নাগাসাকির বাড়ি, তার পর ইয়াশিওর বাড়ি। বিশেষ করে ইয়াশিওর বাড়িতে গিয়ে কল্যাণদা ও শিউলিদির সঙ্গে আড্ডা এবং শিউলিদির (এবং পরে রুমাদিরও) হাতের রান্নার পাশাপাশি বাড়ির জানলা থেকে মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতাম।

কল্যাণদার বাড়িতে গিয়ে ওঁকে প্রায়ই শিউলিদি-কে হাঁক দিতে শুনতাম "ওগো, শুনছো?" বলে। অন্যান্যরা আমাকে জানালেন কথাটা একটু সেকেলে ধরনের, আজকাল এর তেমন ব্যবহার নেই। তবে ডাকটা আমার কানে খুব মধুর লাগত। আজও সেই ডাক যেন আমার কানে লেগে আছে।

কল্যাণ দার মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর আমার জন্য ওঁর রেকর্ড করা "আমরা তিনজন"-এর পাঠ সম্বলিত ক্যাসেট টেপ বের করলাম। চল্লিশেরও বেশি বছর আগে রেকর্ড করা ক্যাসেট টেপ বাজাতে গিয়ে দেখি, তার কিছু অংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে কাঁচি ও স্কচ টেপের সাহায্যে কোনো রকমভাবে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। তার পর সেটি কম্পিউটারে ট্রান্সফার করে ডিজিটাল ফাইল তৈরি করেছি। তার পরে বসে শুনলাম। কল্যাণদার গলা ভেসে এল। গল্পটি পড়া শেষ করার পর কল্যাণদা শিউলিদি-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, "কেমন হল গো?"। এই শুনে চোখের জল সামলাতে পারলাম না আর। ■

কল্যাণদার স্মরণে

- মাসাইয়ুকি উসুদা

কল্যাণদা আর নেই। পরিচিত জনের পর পর অন্তর্ধান মনুষ্যলোকের অনিবার্য নিয়তি বটে। তবু কল্যাণদা যে আর নেই, তা মনের গভীরে অনির্বচনীয় বেদনা সৃষ্টি করে। ওঁকে নিয়ে কয়েকটি স্মৃতি লিপিবদ্ধ করে অতীত দিনের সুখের রাজ্যে ফিরে যেতে চাই।

কল্যাণদার সঙ্গে প্রথম পরিচয় কলকাতায় লেক টেরাস'এর কাছে ওঁর বাড়িতে ১৯৭৩ সালে। দক্ষিণ কলকাতার শান্ত আবাসিক এলাকা লেক টেরাস। রাস্তার ধারে ছোট একতলা বাড়ি। ভেতরে আলো কম। বৈঠকখানার চৌকাঠে হেলান দিয়ে শিউলিদি দাঁড়িয়েছিলেন। একদম নীরব। সুন্দর মুখমণ্ডল বেদনায় আচ্ছন্ন। কল্যাণদা বললেন, "তোমরা নিশ্চয় জানো, কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই শহরে নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রক্তাক্ত কাণ্ড কারখানা চলছিল। সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য ওর কাছ থেকে হাসিমুখ কেড়ে নিয়েছিল"।

যারা শিউলিদির পরের জীবনের উচ্চকণ্ঠের প্রাণখোলা হাসি শুনেছেন, তারা ওঁর সেইদিনের বিষণ্ন মুখখানি কল্পনাও করতে পারবেননা। যাইহোক, কল্যাণদা এই সমস্ত কথাবার্তা উচ্চমানের জাপানি ভাষায় সম্পন্ন করলেন। আমার সঙ্গে তানিগুচি সান আর আমার স্ত্রী ছিলেন। অবাক হয়ে শুনলাম। উনি এই শহরে বসে কি করে জাপানি ভাষা আয়ত্ত করতে পেরেছেন? ওঁর জাপানি পড়ার কায়দা শুনে আমাদের বিস্ময় আরও বেড়ে গেল।

সেই প্রথম দেখাতেই আমরা ওঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই আমরা ওঁর কাছে সত্যজিৎ বাবুর "এক ডজন গপ্‌পো" পড়তে আরম্ভ করেছিলাম। ওঁর ব্যাখ্যা এত স্পষ্ট ও উদ্দীপক যে আমরা একটু একটু ক'রে বাঙালি জীবনের খুঁটিনাটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। শুধু চমৎকার ভাষার ব্যবহারই নয়, সামাজিক জীবনের অন্তঃপুরের সম্যক ধারণা দেওয়াও ছিল তাঁর কার্যতালিকার এক বিশেষ অঙ্গ। এক ডজনের মধ্যে কয়েকটি পড়ার পর একদিন কল্যাণদা আমাদের নিয়ে গেলেন সত্যজিৎ বাবু'র বাড়িতে। আলাপের শেষে সত্যজিৎ বাবু অনুমতি দিলেন সেই গল্পগুচ্ছের যে কোনো একটির জাপানি অনুবাদ প্রকাশ করতে।

কয়েক মাস পর কল্যাণদা সপরিবার তোকিও অভিমুখে চলে গেলেন। ওঁদের মেয়ে এনিকা চানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার বয়স হল। এই ব্যাপারে নারা সেনসেই আমার বাবাকে (উনি তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার ছিলেন) সাহায্য করতে অনুরোধ করলেন। বাবা কল্যাণদাকে এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়ে গিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছিলেন। এভাবে কল্যাণদা আমাদের পরিবারেরও পরিচিত একজন হয়ে দাঁড়ান।

আমরা কলকাতায় পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে এলাম। তারপর বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী কয়েকজন মিলে টোকিও বিদেশীভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নারা সেনসেইয়ের কক্ষে "বাংলা পাঠ চক্র" নামক একটি ছোট দল গড়ে, প্রত্যেক বুধবার বাংলা বই পড়তে আরম্ভ করলাম। কল্যাণদা উপস্থিত থাকতেন টিউটর হিসেবে। পড়া গল্পের সংখ্যা যখন বেশ কিছুতে পৌছালো তখন "কল্যাণী" (কল্যাণদার নাম অনুসারে) নামে একটি পত্রিকা বার করলাম। আসলে এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ওনিশি সান, ঁনাগাই সান আর ওয়াতানাবে সান। তখন সত্যিই সুখের দিন ছিল। আন্ডার গ্র্যাজুয়েটে পড়া নিওয়া সান তখন তরুণী। সকাল দশটা থেকে আরম্ভ করে প্রায় আড়াই ঘন্টা পড়াড় পর কফি-টাইম, অনেক গল্প করতাম। সেই সময় নারা সেনসেইও এসে উপস্থিত হতেন। এই চক্রের উজ্জ্বল কেন্দ্রীয় তারকা ছিলেন কল্যাণদা। কত মজার মজার গল্প শুনতাম ওঁর মুখে। কত আনন্দের সময় কাটাতাম।

ব্যক্তিগতভাবেও আমি কল্যাণদার কাছে ঋণী। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ছ'মাস গবেষণার কাজ করে ইংরেজিতে কষ্ট করে একটি লম্বা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। কিন্তু নিজের ইংরেজি রচনায় ইংরেজির উপর আস্থা ছিলনা। কল্যাণদাকে অনুরোধ করলাম সেটা সংশোধন করতে। উনিও নিশ্চয়ই ব্যস্ত ছিলেন। তবু কল্যাণদা যথাসময়ে সংশোধনের কাজ শেষ করে আমার চলনসই প্রবন্ধকে বেশ ভাল প্রবন্ধে রূপান্তরিত করার পর ফেরত দিলেন।

সবশেষে বলতে হবে কল্যাণদার কাছে কথা দিয়েও রাখতে পারিনি এমন প্রতিশ্রুতি আমার আছে। কল্যাণদা বোধহয় দৃষ্টিহীনদের জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করতেন। একদিন আমাকে রবীন্দ্রনাথের "দুঃসময়" কবিতাটি জাপানিতে তর্জমা করতে বলেন। আমি একবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু মনের মত হয়নি। তারপরে এতদিন পর্যন্ত করবো করবো করেও করতে পারিনি। দুঃখের বিষয়, কল্যাণদাকে কথা দিয়েও কথা রাখতে পারিনি। এবার কল্যাণদাকে স্মরণ করতে করতে অনুবাদটি শেষ করেছি। সেটি কল্যাণদার স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করছি ----

わざわいの時

ロビンロナト・タクゥル

たとえ夕暮れが　ゆっくりと　たゆたげに　おとずれ
　すべての歌が　それを汐に　止んでしまったとしても
たとえ果てしない空に　道連れがいなくても
　たとえ疲労が　手足を重たくして
大いなる怖れが　無言の呪文のうちに　数珠をまさぐり
　あたり一面が　ヴェールで包まれたとしても——
それでも鳥よ、おお　わたしの鳥よ
　すぐに　翼をたたんではならない　盲いた鳥よ‡

これは　ちがう　とよもす　森の葉擦れのざわめきではない
　これは　大蛇の咆哮に　海が　膨れ上がっているのだ
これは　ちがう　クンドの花の香りにむせぶ　四阿ではない
　泡立つ大波が　とどろいて　ゆれているのだ
どこなのだ　あの岸は　花や葉の茂る岸辺は
　どこなのだ　巣は　身を寄せる枝は　どこに！
それでも鳥よ、おお　わたしの鳥よ
　すぐに　翼をたたんではならない　盲いた鳥よ

今もなお　前方には　長い長い夜が　ひかえている
　太陽は　眠っている　はるかに遠い　神話の山に
世界はどこも　息をひそめて
　ひとり　ひっそり座について　時を数えている
たった今　姿を現したのは　岸のない漆黒の闇を泳いで
　遠くの地平線に　細く曲がった爪の月
おお　鳥よ　おお　わたしの鳥よ
　すぐに　翼をたたんではならない　盲いた鳥よ

空の高みでは　星たちが　指をひらいて
　合図して　おまえの方を　眺めている
下界では　深々と揺れ動く死が　あふれて
　百の波頭をもたげて　おまえの方に　押し寄せる
はるか遠くの岸で　だれかが呼ぶ　両手を丸くメガフォンにして——

おお　「おいで　おいで」の声に　悲しい願いが籠もっている
　鳥よ　おお　わたしの鳥よ
　すぐに　翼をたたんではならない　盲いた鳥よ

おお　恐れはない　情愛のしがらみもない——
　おお　希望はない、希望はあだな欺瞞にすぎない
おお　言葉はない、むなしく座して　泣くこともない
　おお　家はない、花の褥の支度もない
あるのは　ただ翼だけ、あるのは　大空の中庭と
　濃密な闇が織りなす　方角を失くした夜明けだ
おお　鳥よ　おお　わたしの鳥よ
　すぐに　翼をたたんではならない　盲いた鳥よ

カルカッタ、ジョラシャンコ
一三〇四年ボイシャク月十四日

কল্যাণদার স্মৃতি

- কিয়োকো নিওয়া

ঠিক বলতে পারছি না, মনে হয় আমার প্রথমবার কল্যাণদার সাথে দেখা হয় ১৯৮১ বা '৮২ সালে। তখন নারা-সেনসেই-এর রিসার্চ রুমে বাংলা সাহিত্যের পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সেদিন নারা-সেনসেই ছিলেন না, বরং কল্যাণদাই পাঠচক্র পরিচালনা করছিলেন। এই পাঠচক্রটি প্রচলিত প্রথানুযায়ী ক্লাস ছিল না, যারা বাংলা সাহিত্য পড়তে চায় তারা কোনো একটা ভালো রচনা পড়বার উদ্দেশ্যে একসঙ্গে মিলিত হত। উসুদা-সেনসেই বা ওওনিশি-সানের মত বিশেষজ্ঞও সেখানে ছিলেন যাঁদের নিজেদের পড়তে কোনো অসুবিধা ছিল না, অন্য দিকে আমার মত ছাত্রীও ছিল যার কিছু জানা ছিল না।

আমি তখন এম এ-র ছাত্রী ছিলাম। হিন্দির ছাত্রী হলেও রবীন্দ্রনাথের রচনায় মুগ্ধ হয়ে নিজে নিজে বাংলা শিখতে শুরু করেছি মাত্র। তখনও আমি বাংলা ঠিক পড়তে পারতাম না, একদম বলতেও পারতাম না। মাঝে মাঝে কল্যাণদা বিশেষ শব্দ বা বর্ণনার ব্যাখ্যা করে দিতেন। আমি শুধু শুনতে থাকতাম কল্যাণদার কথা, অথবা উসুদা-সেনসেই বা ওওনিশি-সানের সঙ্গে কল্যাণদার সাহিত্যচর্চা। দূর থেকে দেখছিলাম কল্যাণদাকে তখন। জানতাম কল্যাণদা অত্যন্ত ভাল জাপানি জানেন ও নিজেও ভাষাবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ, তবে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার আমার সাহস ছিলনা।

১৯৮৩ সালে আমি বিয়ে করে টোকিও ছেড়ে ফুকুওকা শহরে থাকতে গেলাম। সেখানে আমি প্রধানত ইংরেজী শেখাতাম। শহরটা ভাল, নিজেদের জীবনযাপনে কোনো অসুবিধা বা অতৃপ্তি ছিল না, তবে সেভাবে ভারত বা বাংলা সাহিত্য থেকে দূরে থাকাটা আমার ইচ্ছা ছিল না। অবশেষে ১৯৮৪ সালে ভারত সরকারের স্কলারশিপ পেয়ে বাংলা সাহিত্যের গবেষণা করার জন্যে কলকাতায় যাওয়ার কথা ঠিক করলাম।

তিন বছর পরে জাপানে ফিরে এলাম, তবে পাঠচক্র আর চলছিল না বলে কল্যাণদার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ বিশেষ পাইনি। কখনো কখনো দেখা হত দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠানে আর কিছু না কিছু কথাও হত। কল্যাণদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সব সময় মনে হত আমার আরো বেশি শেখার আছে।

যখন আমি গৌরী আইয়ুবের সঙ্গে মাতসুও বাশোর ওকুনো হোসোমিচির (দূর প্রদেশের সংকীর্ণ পথ) অনুবাদ করছিলাম, তখন কল্যাণদার কাছে কয়েকটা পরামর্শ পেয়েছিলাম। তাদের মধ্যে একটা ছিল যে এটা প্রাচীন রচনা বলে সাধু ভাষায় অনুবাদ করা উচিত, কিন্তু সেই প্রস্তাব আমরা নিতে পারলাম না কারণ গৌরীদির তাতে সায় ছিলনা। বইটা প্রকাশিত হল ১৯৯০ সালে। দুঃখ হয় কারণ তারপরে অনুবাদ নিয়ে কল্যাণদার সঙ্গে বিশেষ চর্চা করার সুযোগ পাইনি।

কোন সালে আমার মনে নেই, কল্যাণদা আমেরিকা চলে গেলেন বসবাস করার জন্যে। আমি সব সময় ভাবতাম পরের বার সুযোগ এলেই ওনার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলব। তবে সেই সুযোগ আর পেলাম না। তিনি চলে গেলেন। আমার কথা তাঁর মনে ছিল কিনা জানিনা, তবে আমার স্পষ্ট মনে আছে তাঁর বুদ্ধিমত্তা, সক্রিয় ও হাসিখুশি আলাপ-আলোচনার ভঙ্গি। দুঃখের বিষয় হল আমি সব সময় আগামীবারের কথা ভাবতাম, তবে সেই আগামীবার কখনও আসেনি। ■

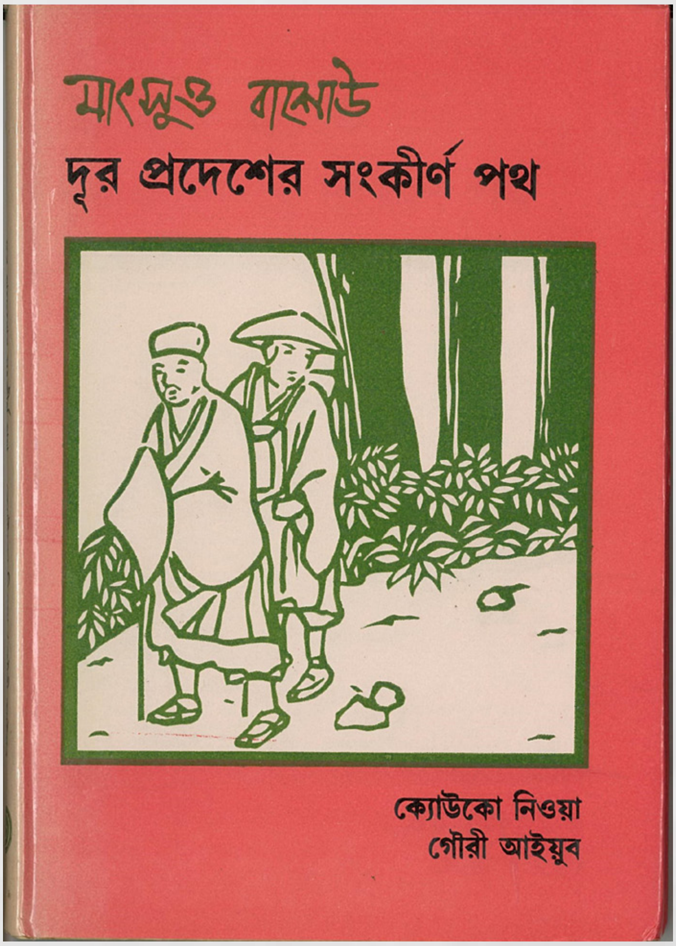

コッリャンダの「ওগো オゴ～、」

－ 奥田由香

　お盆を迎えたというのに、ベランダの朝顔さえ躊躇うかのように、固く結んだ青をなかなか開こうとしない。こんな風に思うのも、コロナの呪縛だろうか。目にもとまらぬ微小なる不可思議な物体から身を守ろうと小刻みに揺れ惑う私たちの姿は、あちら側にもし鏡があるとしたら、どう映っているのだろう。そんな私の問いに、几帳面に応えてくれそうな人がいた。遠い記憶の向こうから、懐かしいその声が聞こえてくる。

　声の主は、コッリャン・ダスグプタさん、私が初めて出会ったベンガルファミリーの大黒柱だ。当時私はタゴールのベンガルを目指し、インド留学に胸を膨らませ、半身乗り出す勢いだったと思う。考えてみると、コッリャンダの声を聞いたのは、その短い巣立ちの期間と、後に一時帰国する度に迎えてくださった、八潮のお宅でのひと時だった。巣立った地の匂いを忘れぬ渡り鳥のように、私にとってコッリャンダのベンガル語の響きは、帰るべき地だったのだろう。暫くして、コッリャンダファミリーは日本からアメリカに居を移され、それからというもの、私は帰るべき音から遠ざかってしまい、その音は遂に、永遠に求め続ける音となってしまったのだ。けれど、消えてしまったわけではない。耳を通過した声の記憶というのは不思議だ、何よりもその人であり続けるのだから。

　コッリャンダのベンガル語で、私を魅了した最初の言葉は、「オゴ～、」だった。奥さんのシウリディを呼ぶ時に、決まってそう呼ぶのだ。ちょっと離れたキッチンの方からシウリディが、その度に応答する。その「オゴ～、」の響きがなんとも心地よくて、ある時思わずコッリャンダに尋ねてしまったのだ、どうして「オゴ～、」と呼ぶのですか、その意味は何なのですか、と。すると、おやおや何を言い出すかと思えば、とでも言うように大きな瞳の目尻を和らげて、深く腰掛けていたソファーから一旦身を起こすように座り直して、おもむろに「それはですね～、」と答えてくださった、あの情景が私の目の奥に焼き付いている。そう、コッリャンダにどんな質問をしても、必ず解説が返ってくるのだ。質問の種が、数十倍にも膨らんで、まるでポップコーンのように香ばしく、弾ける楽しみとなって。ベンガルの人たちは会話好きだと、それまで話には聞いていたけれど、コッリャンダファミリーの中に入った時、会話とは、ある種のご馳走なんだと実感したのだ。いくつかの材料をファミリーのメンバーが回し合いながら、時にスパイスを投入したり、沸騰させたりして、どこかのタイミングで予想もしていなかったフレッシュなアイテムが出来上がる、それこそが会話の醍醐味だということを。

　コッリャンダとシウリディの愛娘、長女のエニカちゃんはそういう環境で育ったせいだろうか、彼女の落ち着いた話し方は、私よりずっと年上に思えた。物静かにピアノの椅子に腰掛け、お父さんの言葉に耳を傾けていた。次女は日本で生まれたので、キクちゃんという名前だと嬉しそうに紹介してくださったのもコッリャンダだ。幼稚園に通っていたキクちゃんは、とてもはにかみ屋さんで幼いモナ・リザのようだった。八潮のお宅に同居されていたもう一つのファミリーは、シウリディの弟ゴウトムダと奥さんのルマディ。息子のロニちゃんは、キクちゃんよりもまだ小さかったが、彼もまた小さなジェントルマンだった。ルマディは、私がこれからシャンティニケタンに留学しても生活に困らないようにと、ベンガル語会話を教えて下さった。こうして家長コッリャンダを軸とする総勢7人のジョイントファミリーの中で、私は日本に居ながらにして、実は最も素晴らしい本物のベンガルに触れさせていただいていたのだった。ジョイントファミリーという形はインドでは珍しくはないが、私は何か言いしれぬ温もりを感じた。そして、インド留学に旅立ち、コルカタのシウリディのご実家でお世話になって、温もりの原点を確信したのだ。

　コルカタ、ゴルフグリーンのレジェントエステート。そこに、シウリディのご両親と弟さん家族、三世代が身を寄せ合って暮らして

いた。弟さんの愛息子トゥバイ君は笑顔の美しい小さな大使だった。留学中、そこは私にとって完全なるオアシスだった。萎みかけて辿り着いた時など、どれだけこのご家族に救われたことだろう。ベンガル語で言いたいことの半分も言い表せないもどかしさまで、丸ごと真剣に受けとめようとして下さるご両親の大きな懐に入ると、途端に一筋の光が差し込んでくるようだった。それは紛れもない「親身さ」、温もりの原点だ。私は思う、家族に流れる喜びの芽を伸ばす力、悔しさをバネにする力、そして、あるがままを受け容れる愛こそが、ベンガル、ひいてはインドの本当の豊かさの根幹であると。豊かさを育む豊かさは、家族を単位にその内側から生まれてくるものなのだということを、その当時も今も疑わない。シウリディのお父様は、生前『 স্মৃতির কিরণে দেখা 思い出

の光に照らして』という自伝を出版されている。そこに書かれているのはご自身の功績ではなく、すべてご家族のことだ。一人ひとりの面影が浮かんでくるほど、丁寧に優しいタッチで大事に語られている。読み進めながら、家族との関わりの中にお父様、キロンモエ・グプタという人のシルエットが生き生きと浮かび上がってくる。そして、何と有り難いことに、そこに私のことまで触れてくださっている。Yukaはシャンティニケタンから泊まりに来ては、ロビンドロションギートを歌って聞かせ、我が家の娘になったと。そう、お父様もお母様も、いつだって心を込めて、私の拙い歌を聞いてくださったのだ。そして又、私の母との富士山旅行の思い出も印象的だったようで、それは母にとっても生涯忘れられない思い出のページだ。お父様の記憶は素晴らしく、富士山旅行のページには、初めて入る温泉風呂について、同行したコッリャンダの詳しい解説が記されている。「お義父さん、お風呂に入る前に、お風呂について少々説明させてください。お風呂場にはシャワーとその下に蛇口があります。その脇に四角い生け簀のような浴槽があります。そこには、とても熱いお湯が張ってあります。先ず石鹸で身体をよく洗いシャワーで流し、それから浴槽に入

るのです。この浴槽のことを「お風呂」と言うんです。お風呂のお湯は入る人が我慢できる、ほどよい熱さになっています。お湯に浸かっていると、次第に身体が温まってきます。一日の仕事を終え、ゆっくり浸かっていると疲れがすうっと取れて、よく眠れるんですよ。しかも身体の節々の痛みも和らぎます。その昔、日本では家にお風呂がある家庭は少なかったので、近所のお風呂屋さんに入りに行ったそうです。今でも、そういうお風呂やさんはあって、夕食をすませてから仲間とお風呂に入りにいく、という人も少なくないんです。聞いた話しによると、互いに互いの背中を流し合うらしいですよ。」

なんと微笑ましい情景だろう。お風呂の入り方について少々の説明をするコッリャンダと、それをじっくりと聞くお義父さんの姿が湯けむりの向こうに浮かんでくるようだ。

この自伝の最後に、ご家族お一人お一人から祝辞のメッセージが捧げられている。シウリディは、もう一度生まれ変わっても、この両親の元に生まれたいと。そして、コッリャンダは、「私のお義父様」と題し、思いを綴られた一「私と義父キロン・グプタ氏との最初の出会いは、1965年の中頃だった。当時、私はチェンナイで働いており、仕事の関係でコルカタに帰郷し、その最中に婚約が成立したのだ。義父にとっての長女であり唯一の娘との結婚話だ。二人の息子と友人を一人連れて、私の元に会いに来られた。そして、翌年の1月に結婚し、それ以来私はグプタ家の婿である。

初対面の時から今日まで45年間、私は義父のことを一人の人格者として見てきた。窮地に立たされた時など、義父の助言を頼りにしてきた。それは私の人生に掛け替えのない経験となり、彼の思慮深い判断は、どんな時も間違いはなかった。唯一、彼の娘の将来についての判断が正しかったかは定かではない。

キロンモエ・グプタという一人の人間像について、この本から伝わってくることは多いだろう。しかし、彼自身の言葉で本人のことが語られていないではないか。例えば、一冊の本について彼が語る時、その本の真髄と彼の心模様がいかに共鳴しているのか、聞く者を感動に包み込んでしまうこと。この45年間というもの、私はいつも驚きの眼差しで見つめてきた、とどまることのない彼の生命力を。私が一時期オリッサに赴任していた時のこと、義父が義母と二人の息子を連れて夜行列車でやってきた。彼は、すぐにそこの環境が気に入り、とりわけ社宅近くの小高い丘を見て感激していた。それは誰が見ても美しいと思うのだが、彼は他の人とは違った。あの丘を登って頂上に立つと言い出したかと思うと、もう歩き出していた。そして、その言葉通り頂上まで登り、丘の上から一望する景色を堪能して降りてきた。その時、私は彼が本当に羨ましいと感じた。ああ、自分の周囲をこんなにまで楽しむことのできる力が、なぜ私にはないのだとうと。そう、身近にあるものを驚きを以て楽しむ気持ちが内から溢れてくる、そういう人を私は彼の他に出会ったかと言うと思い当たらない。この天から与えられた才能で今も揺らぐことはなく、どんなに苦難に打ちのめされてもへこたれることはない。

彼を心から尊敬することが私の喜びの根源であり、私の人生の道標でもある。プロナームを捧げてペンを置くことにしよう。

彼が人生を振り返り、この一冊に込めた願いが形になりますように。思い出の一片一片が次の世代に英気を与えますように。」

尊敬すべきお義父さんとコッリャンダは彼岸でも互いに共鳴しあっているに違いない。私は、このお二人の家族の深い絆を通して、揺らぐことなく生きてゆく生の姿を見せていただいたと思っている。だから、コッリャンダとの思い出はと問われれば、家族という豊潤な関係と切り離すことはできないのだ。あちらの鏡に映る私たちに、きっと変わらぬエールを送ってくれていると思う。

最後に、私の質問「オゴ〜、」にコッリャンダの答えはこうだった。満面の笑みを湛え「それはですね〜、一番愛しい人に尊敬の気持ちをこめて呼ぶ音なのですよ」と。その時から今も「オゴ〜、」は、永遠にコッリャンダの音なのだ。

প্রণাম 合掌

K. Dasgupta 家との思い出

– Akiko Nara

K.Dasgupta さんが奥様のSeuli さんとお嬢さんさんのエニカちゃんと来日されたのは、47年前の事です。Dasgupta　さんが、私が初めてお目にかかった時、流ちょうに日本語を話せれて驚いた記憶があります。Dasgupta さんは翻訳の仕事以外にベンガル語やベンガル文学やベンガル歴史学の若い研究者のグループに、私の late husband の大学の研究室で advice　されていました。その若い研究者の方々は、後に、大学の Prof. になられ、各々の分野で活躍されています。私は　Dasgupta さんのお宅に招かれるのを、とても楽しみにしていました。奥さんの作るおいしいベンガル料理を食べられるからです。食後今は亡きkarabiさんがおいしいミルクティーを作って下さった事もなつかし思い出です。エニカちゃんは、1才の我家の息子ヒロカズをだっこしたり、かわいがって下さいました。

数年後次女のキクちゃんが誕生し、その後我家にも娘のナオコが生まれ、後にseuliさんの弟さんのR.Gupta　さん一家が来日し息子さんのロニー君も加わって、我家の子供達は皆で遊ぶのをとても楽しにみにしていました。私の娘のナオコが1番年下でしたので、皆が気をつかって遊ばせてくれていました。数年前ロニーさんから「ナオコちゃんがお医者さんになって、ぼく達が患者さんの役としてお医者さんごっこをよくしていたんですよ」となつかしい思い出話を聞きました。今は皆結婚してそれぞれ幸せな家族を築けている事を幸せに思っています。エニカさんは全くとわらない言語力で、日本語並びに日本文化を教えていらっしゃる事も嬉しく思います。Dasguptaさんもきっと喜んでいらっしゃる事でしょう。Seuli　サン、エニカさん、キクさんが来日される機会が1日も早く来るよう祈っています。 ■

コッラン・ダーシュグプト先生の思い出

– 齋藤　治之

私がコッラン・ダーシュグプト先生に初めてお目にかかったのは1975年の東京外国語大学ベンガル語夏期講習会の教室で、先生は他の数名のベンガル語ネイティブスピーカーと共にその中心的存在として我々の学習の手助けをして下さいました。夏期講習会が終了した後も講座参加者数名と読書会を発足し、毎週集まってベンガル語の作品を翻訳し、コッラニという同人誌も刊行しましたが、その際にはダーシュグプト先生のみが毎回我々の翻訳の誤りを訂正し正確で美しい日本語訳の完成へと導いて下さいました。時には池袋から数駅の東長崎にあった先生のお宅で開かれることもあり、香辛料の芳香で満たされたお部屋でのベンガル語の学習は私をそれまで未知の世界へと誘ってくれました。私が当時ドイツ語を専攻していた関係で、先生は私にドイツで出版されたKollol（コッロル）という名のベンガル文学作品をドイツ語に翻訳して掲載した同人誌を見せて下さいました。我々の同人誌は会の中心メンバーである永井保さんがドイツの同人誌名を知らずに先生の苗字Kalyan（コッラン）に因んでその女性形であるKalyanī（コッラニ）に基づいて命名したものであり、ドイツの同人誌と意味は全く異なりますが音がとてもよく似ていることに驚いた記憶があります。先生も同じ感想を抱いたのではないかと思います。

インドの知識人にとっては当然のことかもしれませんが、先生は母語のベンガル語のみでなくインド各地の諸言語、サンスクリット語、パーリ語を始めとするインド古語にも通じており、また、他のインド・ヨーロッパ諸語についても広く深い知識を持っておられました。私もインド・ヨーロッパ語比較言語学に興味を持ち、大学卒業後もそれを専門にしたいと考えていたので先生との会話の話題は当然この分野に関することが主でした。最もよく覚えているのは何かある機会に先生と一緒に渋谷に行く山手線の車中で先生がロシア語のčelovek（人）という語がサンスクリット語のcāla　vāka（歩き話す者）で説明することができると私に語ったことです。確かに音韻的には問題ないかもしれませんが、このような語源的解釈を私はその時初めて聞いたので驚いて先生の顔を見つめてしまいましたが、先生は別に突飛な学説を披露したという様子もなく普段と同じ冷静な表情のままでした。このような発想は日本人には到底不可能であり、人間という存在を把握し理解する方法がインドの人々と我々とでは全く異なっていることを私に痛感させたこの瞬間は今でも私の記憶に鮮明に残っています。その後、私がある私立大学のドイツ語教員としてドイツ語で書かれた古代ドイツ語に関する紀要論文の抜き刷りを先生に差し上げる機会がありましたが、この話はそれで終わることなく私の学問人生に決定的な局面を切り開くきっかけを与えることになりました。それは、当時先生がある翻訳関係の会社で仕事をしていて私の論文をデスクの上に置いたままにしていたところ、隣の席の人が興味を抱いてこの論文の著者は誰かと先生に尋ねたそうです。その人はゲルマン古語の勉強会を主催しており、先生の仲介で私もその勉強会に参加することを許され、その後約15年に亘って私は自分の専門分野であるゲルマン語の知識を深めることができました。この奇妙な偶然の出会いを作り出し、私に研究者としての道を示して下さった先生には今でも感謝の気持ちでいっぱいです。このように先生は日本の様々な人々との交流関係の中でそれぞれの人々に忘れ難い思い出と恩恵を与えた存在として皆の記憶に残され、それは今後とも消えることがないと確信しています。また、上に述べた幾つかの例からも分かるように、先生には互いに無関係に存在する事柄を目に見えぬ力によって結び付ける何か不思議な能力があるのではないかと思えてなりません。そのことは先生がSF小説をこよなく愛し数編の作品を日本語からベンガル語に翻訳したことからも窺い知ることができるのかもしれません。 ■